Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 309 - 313
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রাঢ়ের উপজাতিদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পরিবেশ ভাবনা : একটি গবেষণালব্ধ ধারণা

সুতনু দাস
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sutanudas1710@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Rarh, Scheduled Tribe, Forest, Sarnadharma, Worshipers of Nature, Environmental Values.

Abstract
The Scheduled Tribes of Rarh began their early life as hunter-gatherers but later became shepherd and now focus on agriculture. Once accustomed to forest life, these people left the forest life in due course, but they could not break their bond with the forest and other elements of nature. If we look at their economic and cultural activities, we can see that their dependence on the natural environment is the root of their lives. Therefore, the forest dwellers of Rarh have been worshiping this nature-environment as a field of livelihood and a playground of cultural-religious activities through their faith-reformation sibce time immemorial. Today they feel comfortable identifying themselves as Sarnadharma i.e. worshipers of nature. Nature and environment are closely involved in their clan reform, livelihood, rituals. Therefore, the activity of these tribes is quite relevant in the environment in the current aggressive urban culture.

Discussion

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সুহ্মঃ রাঢ়ঃ অর্থাৎ সুহ্ম ও রাঢ় এক ও অভিন্ন। মহাভারতে বলা হয়েছে, অসুর রাজা বলির ক্ষেত্রজ সন্তানসমূহ থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে। এখানে উল্লেখিত সুহ্ম জাতিসমূহকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠা সুহ্ম জনপদের মধ্যেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বৃহদাংশ পড়েছে। তাই বলাবাহুল্য, রাঢ় হল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যা প্রাচীনকালে এক অন্যতম জনপদ ছিল। জৈনদের ধর্মপুস্তক 'আচারঙ্গ সূত্র'তে সর্বপ্রথম রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে রাঢ় অঞ্চল বজ্জভূমি (বজ্রভূমি) ও সুবহ্ভূমি (সুহ্মভূমি) নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সম্ভবত খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতকের পরবর্তী সময়ে অজয় নদকে মধ্যবর্তী সীমারেখা রূপে কল্পনা ক'রে

বজ্জভূমি (বজ্রভূমি)কে উত্তর রাঢ় এবং সুবহ্ভূমি (সুক্ষভূমি)কে দক্ষিণ রাঢ় নামে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে অজয় নদের উত্তরে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ নিয়ে উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুরের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে দক্ষিণ রাঢ়।[১]

শাল, মহুয়া, পলাশ, পিয়ালের গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত পাহাড়, ডুংরি, ঢেউখেলানো উঁচু নিচু ভূমি এবং টিলাযুক্ত রাঢ়ে মানব সভ্যতার বিকাশ যে বহুযুগ আগে শুরু হয়েছিল তা এখানে আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আমরা জানতে পারি। রাঢ় অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতার বনিয়াদ গঠন করেছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী প্রাক্-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রালরা (Proto-Australoids)। প্রাচীন সাহিত্যে এঁদের নিষাদ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তফশিলভুক্ত উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, শবর, লোধা প্রভৃতি জনজাতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আদি-অস্ত্রালদের পরে এখানে দ্রাবিড় এবং তারও পরে আর্যভাষাভাষী আল্পীয় গোষ্ঠীর লোকেরা এখানে আসে। প্রাচীন সাহিত্যে এদের যথাক্রমে 'দাস-দস্যু' ও 'অসুর' জাতি ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত এই তিন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে রাঢ়ের মানব সভ্যতা প্রাথমিক ভাবে বিকশিত হয়েছে ব'লে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে অরণ্য অধ্যুষিত রাঢ়ে বহিরাগতদের প্রবেশ বারংবার প্রতিহত হলেও তা একেবারে থেমে থাকেনি। এখানে প্রথমে জৈনমতাবলম্বী আর্যভাষীদের আগমন ঘটে। জৈন মতের পরে বৌদ্ধ মত এবং সর্বশেষে ব্রাহ্মণ্য আর্যভাষাভাষীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। তাই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আর্যভাষী জনগোষ্ঠী আর্বিভাবের পূর্বে রাঢ় সম্পূর্ণ রূপে অনার্যভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা ছিল। বর্তমানে রাঢ় অঞ্চলে যেসব তপশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি বসবাস করে তাঁদের সিংহভাগই অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাভাষী আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীর লোক। এঁরাই রাঢ়ের আদি অধিবাসী।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ৪০টি তফশিলি উপজাতি বা আদিবাসীগোষ্ঠির মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, শবর, লোধা, বিরহড়, মাহালি, হো, কোড়া প্রভৃতি জনজাতির মূল বাসস্থান রাঢ়ের বিভিন্ন জেলায়। আর্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের সংস্কৃতির একদা সমন্বয় ঘটলেও এঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির মৌলিকত্ব খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হয়নি। শিকারজীবি হ'য়ে এঁদের প্রাথমিক জীবন শুরু হ'লেও পরবর্তীকালে এঁরা পশুপালক হ'য়ে বর্তমানে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেছে। একদা অরণ্যজীবনে অভ্যস্ত এইসব জনগোষ্ঠী কালের নিয়মে আরণ্যক জীবন ত্যাগ করলেও অরণ্যসহ প্রকৃতির অনান্য উপাদানসমূহের সঙ্গে নিজেদের নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি। এঁদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের দিকে আলোকপাত করলে আমরা দেখতে পাব প্রকৃতি পরিবেশের প্রতি নির্ভরতা এঁদের জীবনের ভিত্তি। সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রকৃতিই এঁদের লালিত পালিত করে চলেছে, আর এঁরাও নিজেদের আদিম ও স্থূল কৌশলের দ্বারা প্রকৃতি পরিবেশের খেয়াল রেখে চলেছে যুগ-যুগান্তর ধ'রে।

মানব সভ্যতা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে। অজানা অচেনা বিরুদ্ধ প্রকৃতির সাথে প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার তাগিদেই তাঁরা কতকগুলো বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে পাথেয় ক'রে নিতে বাধ্য হয়। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস-অবিশ্বাস থেকেই তাঁরা বিভিন্ন সংস্কারের বশবর্তী হয়। প্রকৃতি সমস্ত উপাদানের মধ্যেই তাঁরা আত্মার অধিষ্ঠান কল্পনা করে। তাঁদের এই বিশ্বাসের পেছনে সর্বপ্রাণবাদ (Animism) কাজ করে। সর্বপ্রাণবাদকে পৃথিবীর পূজা-উপাসনার আদিরূপ ধরা হয়। রাঢ়ের উপজাতিরাও স্মরণাতীত কাল থেকে প্রকৃতির উপাসনা ক'রে আসছে। বর্তমানে এঁরা নিজেদের সারণাধর্মী অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক হিসাবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি এঁদের 'বাহা পরব' কিংবা 'শারহুল' পরবের কথা। যেখানে এঁরা শাল, মহুয়া ফুল উৎসর্গের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে বন্দনা করে। এঁদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলি রাঢ়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নৃতত্ত্ববিদ্ প্রবোধকুমার ভৌমিক বলেছেন–

> "পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিচিত্র দিক লক্ষ্য করা গেছে। স্বাভাবিকভাবে আদি মানুষ যখন তার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা দিয়ে কোন ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারতো না, তখন তারা অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তিকে ঐ সকলের জন্য দায়ী করতো। তারা ভাবতো, মানুষ নানা কারণে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা অশরীরী শক্তির রোশে যখন পড়ে, তখন তার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে ও জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ হয়। এইভাবে সকল উপজাতিগোষ্ঠীর মনের মণিকোঠায় অতিপ্রাকৃত শক্তিনিচয়ের নানা প্রতিফলন ঘটেছে। সাঁওতালরা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 309 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> 'মারাং বুরু' বা পাহাড়ের দেবতাকে বিশেষভাবে পূজা করে। 'জাহের এড়া' বা 'মঁড়েক'কেও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা পায়। মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা হ'ল 'সিং বোঙা'। এছাড়া, বিভিন্ন গ্রামের দেব-দেবী রয়েছেন, বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের পূজা দিতে হয়। কখনও বা মুরগী বা পাঁঠা বলি দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে হয়। লোধাদের গ্রামের দেবতা 'বড়াম' বা 'গরাম'। আসলে বড়াম বনের দেবতা। বড়ামের জন্য বছরে দু'তিনবার পূজা হয়, মুরগী ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। তাদের ধারণা, বড়াম কোন কারণে ক্রুদ্ধ হ'লে গ্রামে নানা রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে।"[২]

এঁদের মধ্যে বৃক্ষ উপাসনারও প্রচলন রয়েছে। গ্রামের প্রান্তে শাল গাছ বা প্রচীন বৃক্ষের তলায় এঁদের উপাসনাস্থল- সাঁওতালদের ক্ষেত্রে 'জাহের থান', মুণ্ডাদের 'সারণা থান', লোধাদের 'বড়াম থান' ইত্যাদি রয়েছে।

রাঢ়ের উপজাতিরা বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যেমন সাঁওতালরা বারোটি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত- হাঁসদা, সরেন, মুর্মু, মাণ্ডি, টুডু, কিস্কু, হেমব্রম, বাস্কে, চঁড়ে, পাঁউরিয়া, বেসড়া এবং বেদিয়া। প্রতিটি গোত্রের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোত্র-সংস্কার বা টোটেম (Totem) বিশ্বাস রয়েছে। ফ্রয়েড টোটেম সম্পর্কে বলেছেন-

> "The totem is first of all the tribal ancestor of the clan, as well as its tutelary spirit and protector; it sends oracles and, though otherwise dangerous, the totem knows and spares its children."[৩]

সুতরাং 'টোটেম' হ'ল সংশ্লিষ্ট গোত্রের রক্ষক ও মঙ্গলকারী পরমাত্মা। এই টোটেমগুলি সাধারণত গাছপালা, ফুল, জীবজন্তু, পাখির নামে চিহ্নিত। টোটেমবাদ বলতে আরণ্যক মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটা প্রয়াসকে বোঝানো হয়। লোকসংস্কৃতিবিদ্ পশুপতি মাহাতো ক্ষেত্রানুসন্ধান ক'রে দেখেছেন- জঙ্গলের বিভিন্ন জীব-জন্তু কেবল তাঁদের বংশধারার প্রতীকই নয়, পাহাড়, গাছ, বুনোঘাসসহ নদী-ঝরনার নামগুলো আজও তাঁদের পূর্বপুরুষের নাম হিসেবে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়।[৪] এক্ষেত্রে রাঢ়ের উপজাতিগোষ্ঠী যেমন– সাঁওতালদের গোত্রানুযায়ী টোটেমগুলি হল হাঁসদা (হাঁস), মুর্মু (নীলগাই), মাণ্ডি (মেরদা নামক ঘাস), কিস্কু (সোনালি ছিল), হেমব্রম (সুপারি), চঁড়ে (গিরগিটি) ইত্যাদি; মুণ্ডাদের মুণ্ডরি (তিতির পাখি), কদুয়া (কচ্ছপ), বারলা (বটগাছ), বাগিয়া (বাঘ), ভেঙ্গরা (ঘোড়া) ইত্যাদি; ভূমিজদের সালরিসি (শাল মাছ), হেমব্রম (পান), সাণ্ডিল্য (এক জাতীয় পক্ষী), হাঁসদা (বুনো হাঁস) ইত্যাদি; শবরদের শাল ভুঁইয়া (শালগাছ), তিড়ন (এক শ্রেণীর পক্ষী) ইত্যাদি; লোধাদের ভক্তা (চিরকা আলু), নায়েক (শাল মাছ), দিগার (শুশুক), আড়ি (চাঁদা মাছ) ইত্যাদি; মাহালিদের বাস্কে (লাল নটে শাক), বেসরা (বাজ পাখি), হাঁসদা (বুনো হাঁস), কিস্কু (মাছরাঙা), টুডু (মেঠো ইঁদুর), ছোরে (গিরগিটি), খাংগার (ডোমকাক) ইত্যাদি; হো'দের বাসোয়ার (বাঁশ), বাঘোয়ার (বাঘ), হাঁসদা (বুনো হাঁস), হেমব্রম (সুপারি), বারলি (বটগাছ), গিধি (শকুন) ইত্যাদি; কোড়াদের কাছুয়া (কচ্ছপ), সমর (শোল মাছ), চিড়ু (কাঠবিড়াল), বুৎকু (শূয়োর) ইত্যাদি। গোত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট টোটেমগুলির প্রতি এঁদের রয়েছে অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। গোত্র নির্দেশক বৃক্ষধারী টোটেমকে এঁরা আঘাত করে না, প্রাণীধারী টোটেমের হত্যা বা মাংসভক্ষণ করে না। এই নঞর্থক সংস্কার নিষেধ বা ট্যাবু (Taboo) নামে পরিচিত। এই ট্যাবু রাঢ়ের উপজাতিগোষ্ঠীর জীবনচর্যার নিয়ামক। এইভাবে এঁরা নিজেদের সংস্কার-ধর্মীয় বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে উক্ত বৃক্ষ, প্রাণীকূলের সংরক্ষণ ক'রে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় নিজেদের ভূমিকা পালন ক'রে চলেছেন।

১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ অরিজিন অফ স্পিসিজ-এ প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের ব্যাখা ক'রেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত প্রাণীদের মধ্যে যোগ্যতম প্রাণীর বংশানুক্রমে উদ্বর্তন ঘটে। এই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে প্রকৃতি, পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অথচ বর্তমান সময়ে মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে পরিবেশ বিপন্ন। ১৯৬২ সালে রাচেল কারসনের প্রকাশিত গ্রন্থ Silent Spring এ লেখিকা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্টে মানবজাতির ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারসনের এই গ্রন্থটি পরিবেশগত বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রথম নিদর্শন হিসাবে ব্যাপক ভাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াবার জন্য বিশ্বব্যাপী মহাসম্মেলন আয়োজিত হয়। সারা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ রক্ষার্থে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হ'ল। বর্তমানে যখন পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য অরণ্য সৃজন, রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার, প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সহ নানান কর্মসূচি গ্রহণ ক'রে চলেছে পরিবেশবিদ্‌রা; তখন রাঢ়ের এই উপজাতিরা নিজেদের আদিম অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে চলেছে যুগ-যুগান্তর ধ'রে। পরিবেশ চেতনা এঁদের সংস্কৃতির মধ্যেই প্রতিফলিত।

রাঢ়ের উপজাতিদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। ফলে এঁদের অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানই কৃষিকাজকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত। চাষের সূচনালগ্ন থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত এঁরা নানা কৃষিকেন্দ্রিক পূজা-পার্বন, আচার-সংস্কার পালন ক'রে থাকে। ভাদ্রমাসের শুক্ল একাদশীতে এঁরা প্রাক্ শস্যোৎসব করম পরব ক'রে। যেটা মূলত অঙ্কুরিত বীজ বপনের উৎসব। কৃষিভিত্তিক এই প্রতীকী উৎসবে জমি ও নারীদেহকে অভিন্ন ধরে উভয়ের মধ্যে সুপ্ত ফলনের সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয়। এছাড়া এঁরা ভাদ্র মাসে আউশ ধানের দেবী ভাদুর উপাসনার পাশাপাশি পৌষ-সংক্রান্তিতে আমন ধানের দেবী টুসুরও উপাসনা করেন। কার্তিক মাসে কৃষিকাজের অন্যতম সহায়ক গবাদি পশুদের বন্দনার জন্য এঁরা 'বাঁধনা পরব' পালন ক'রে থাকেন। পৃথিবীতে শস্য-শ্যামল ক'রে তোলবার অভিপ্রায়ে এঁদের আজন্ম লালিত এইসব বিশ্বাস-সংস্কার আসলে পরিবেশ চেতনার ইঙ্গিতই বহন করে।

পাশাপাশি এঁদের কৃষি পদ্ধতিও পরিবেশ বান্ধব। কৃষি জমিতে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিসহায়ক প্রাণীকুলের ক্ষতিসাধন করছে। কৃষিসহায়ক বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় তাই প্রয়োজন জৈব সার ও প্রাকৃতিক কীটনাশকের। রাঢ়ের এই জনজাতিরা জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব গোবর সার ব্যবহার ক'রে থাকেন। মাঘ মাসের প্রথম দিন এঁরা 'আখাইন যাত্রা' বা 'হাল পুনহ্যা'-র সূচনা করেন। হাল পুনহ্যা মানে হাল চাষের প্রক্রিয়ার সূচনা। এই দিনে বাড়ির পুরুষেরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জমিতে জৈব গোবর সার প্রয়োগ ক'রে। জমিতে জৈব সারের পাশাপাশি ক্ষতিকারক কীটনাশকের বিকল্প হিসাবে শাল, মহুয়ার ডাল, কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত বনজ গুল্ম ব্যবহার ক'রে এঁরা ফসলকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায়ও অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

এছাড়া এঁরা বনের ফল, মূল, কন্দ সংগ্রহ ক'রে জীবিকা নির্বাহ ক'রে। তাঁরা বন থেকে সংগ্রহ করা শালপাতা থেকে থালা-বাটি, সরকাঠি দিয়ে ঝাঁটা, খেঁজুর পাতা দিয়ে চাটা, বাবুই ঘাস থেকে বাবুই দড়ি তৈরি ক'রে বাজারে বিক্রি করে। রাঢ়ের মাহালিদের প্রধান জীবিকাই বাঁশ ও বেত থেকে ঝুড়ি, কুলো, চাঙারী, চুবড়ি, ঝাঁকা ইত্যাদি তৈরী করা। এতে ক'রে একাধারে যেমন তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবে সুরাহা হচ্ছে, তেমনি অপরদিকে তাঁরা পরিবেশের ক্ষতিকারক প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যের সন্ধান দিচ্ছে।

বর্তমানে কৃষিকাজ অন্যতম প্রধান জীবিকা হলেও এঁদের প্রাথমিক জীবন শুরু হয়েছিল শিকারজীবি হিসাবে। আদি জীবনের সেই ধারা বজায় রেখে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় সাঁওতালরা দলবদ্ধভাবে শিকার উৎসব পালন করেন। রাঢ়ের সাঁওতালরা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে সুতান টাঁড়ি নামক ঝোরা-সম্বলিত এক এলাকাকে কেন্দ্র করে মারাংবুরু সেন্দ্রা অর্থাৎ বাৎসরিক শিকারোৎসব করে থাকেন। সেন্দ্রায় সাঁওতালরা ধামসা, মাদল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বনে প্রবেশ করে, যাতে বন্যপ্রাণীর সাথে মুখোমুখি না হ'তে হয়। যদি একান্তই কোনো বন্যপ্রাণী সামনে এসে পড়ে তখনই একমাত্র তার শিকার করা হয়। তাই এটিকে কেবল শিকার উৎসব বললে ভুল বলা হবে। সাঁওতালি ভাষাতে যাকে বলা হয় 'সেন্দ্রা', তার বাংলা অর্থ অনুসন্ধান করা। বিগত বছরে জঙ্গলের মধ্যে যেসব প্রজাতির গাছপালা, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে তা এই বছর পাওয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে অনুসন্ধান। আসলে শিকারাভিযানের মধ্য দিয়ে বনের নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল সম্পর্কে সম্যক ধারণা নবপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে সমগ্র প্রাণ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানব যোগের স্থাপনই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। রাঢ়ের এই অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীরা পরিবেশে বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নানা বিশ্বাস-সংস্কার পোষণ ক'রে চলেছেন বহুযুগ ধরেই। অতি বৃষ্টি বন্ধ করতে তাঁরা ব্যাঙের বিয়ে দেয় কিংবা বাড়ির রমণীরা ঘরের আঙিনায় পিঁড়ি ফেলে রাখে। আবার, বৃষ্টির অভাবে খরার সৃষ্টি হ'লে এঁরা নিজ নিজ উপাস্য দেব-দেবীর শরণাপন্ন হ'য়ে পৃথিবীতে বৃষ্টি নেমে আসার প্রার্থনা জানায়। যেমন- ভূমিজরা তাঁদের বনদেবতা 'লটুয়া'-র উদ্দেশে পূজা করে যাতে বৃষ্টি নামে। তাঁদের এই বিশ্বাস-সংস্কারের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়।

জল, জঙ্গল, জমিকে কেন্দ্র ক'রেই রাঢ়ের উপজাতিদের জীবন আবর্তিত হ'য়ে চলেছে। অথচ ১৮৫৫ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির 'ভারতীয় বন সংক্রান্ত সনদ' নামে পরিচিত ব্রিটিশ ভারতে প্রথম বননীতি ঘোষণার

সাথেই অরণ্যচারী এই মানুষদের জীবন-জীবিকায় ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছিল। প্রথমে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে অরণ্য আইন পাশ ক'রে অরণ্য সম্পদকে সরকারি সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়। এরপরে ১৮৭৮ এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে দু'টি অরণ্য আইনের দ্বারা অরণ্য এবং অরণ্য সম্পদের ওপর অরণ্যচারী এই মানুষদের সহজাত অধিকারকে খর্ব করা হয়। তাঁদের অরণ্যে প্রবেশ এবং অরণ্যজাত দ্রব্যের সংগ্রহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এছাড়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য অরণ্য আইনকে প্রয়োগ ক'রে তাঁদের চিরাচরিত ঝুম চাষ বা স্থানান্তর কৃষিকাজ (Shifting Cultivation)-এ বাধা সৃষ্টি ক'রে স্থায়ী কৃষিকাজ (Settled Cultivation)-এ বাধ্য করা হয়। নিজেদের মাতৃসমা অরণ্যে বহিরাগতদের এমন হস্তক্ষেপ তাঁদের মনে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। তবে বননীতি ঘোষণার সাথেই যে এঁদের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনে প্রথম বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছিল তা নয়। এর বহু পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আবাদি জমির পাশাপাশি পতিত জমির খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের ফরমান দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, জঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে সেগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দিতে শুরু করল। মাতৃসমা জঙ্গলের অধিকার এই ভাবে খর্ব হওয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আন্দোলনে নামেন রাঢ়ের লোধা-শবরেরা। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকরা কুশু আড়ি নামে বিদ্রোহী লোধা-শবরদের এক নেতাকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে খড়গপুরের অদূরে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে এবং ঐ সময়ে ঝাড়গ্রাম এলাকার একস্থানে সাতজন বিদ্রোহী লোধা-শবর নেতাকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উক্ত দু'টি স্থানের নাম দেওয়া হয় 'কেশিয়াড়ী' এবং 'লোধাশুলি'। লোধা-শবরদের এই আন্দোলনকে ভারতবর্ষের আদিম জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বা স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলন হিসাবে স্মরণ করা কর্তব্য।[৫] তাই ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পৃথক পৃথক Criminal Tribe Act পাশ ক'রে বাধাদানকারী তফশিলি উপজাতিদের অপরাধ-প্রবণ জনজাতি হিসেবে চিহ্নিত ক'রে তাঁদের স্বাধিকারকে খর্ব ক'রে দেয়। অবশেষে স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম ২০০৬ সালে আইন ক'রে অরণ্যে বসবাসকারী তফশিলি উপজাতিদের ও অন্যান্য ঐতিহ্যশালী বাসীদের বসবাস ও জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত নিজ নিজ চাষের জন্য অরণ্যভূমি ধ'রে রাখা ও অরণ্যে বাস করার অধিকার দেওয়া হয়।

সবশেষে বলা যায়, অরণ্য শুধুমাত্র এঁদের জীবিকা সংস্থানের ক্ষেত্রভূমি নয়; সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের লীলাভূমিও বটে। প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে এঁদের নাড়ির বন্ধন আদি-অনাদিকাল ধ'রে। বর্তমানে যেখানে আগ্রাসী নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা প্রকৃতির বুক চিরে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে, তখন পরিবেশ সংরক্ষণে এই সব জনজাতিদের কার্যকলাপ অনেকখানি প্রাসঙ্গিক। তাই সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন-

> "মানুষের শুভবুদ্ধির উপরেই প্রকৃতির যথার্থ ভারসাম্য রক্ষা পায়। সুখের বিষয়, আজ দুনিয়া জুড়ে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশে দেশে যে জনমত গড়ে উঠছে, তাতে মানুষকে এই শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করেই প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করতে বলা হচ্ছে। এসব কথা ভাবতে বসলেই বিরসাকে আমার খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়।"[৬]

Reference:

১. সিংহ, মানিকলাল, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৮, পৃ. ১
২. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, আদিবাসী, রায় প্রণব (সম্পাদক), মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (তৃতীয় খণ্ড), সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৩৩১
৩. Freud Sigmund, Totem and Taboo, George Routledge & Sons Limited, London, 1919, P. 39
৪. মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পূর্বালোক পাব্লিকেশন, কলকাতা, পূর্বালোক পুনর্মুদ্রণ- মার্চ ২০১২, পৃ. ৩৪
৫. ভক্তা, প্রহ্লাদকুমার, লোধাশবর জাতির সমাজজীবন, মারাংবুরু, মেছেদা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ- মার্চ ২০১৬, পৃ. ২৯
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ষষ্ঠবিংশ মুদ্রণ- জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, পৃ. ১৩